International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XI, December 2016, Page No. 22-26
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিমবঙ্গের সীমানাবর্তী ঝাড়খণ্ডের মানবজীবনের দামোদর নদীর প্রভাব

শর্মিষ্ঠা আচার্য
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Abstract

Manbhum was broken into three parts by the 'Bihar and West Bengal Transfer Territories Act' of 1956. As a consequence, the Bengali-speaking regions like Dhanbad, Chandankeary and Chash were separated to include them into Bihar. And finally on 1 November 1956, the rest part of Manbhumwas included into West Bengal as a district namely Purulia. On the other hand, on 15 November 2000, Bihar was again broken to create the new state Jharkhand. Politics might have separated these two places, but Nature has not been so heartless. The great Damodar River, which flows between the two states Bengal and Jharkhand, has massive impact upon the social, economic and cultural lives of these two states. Once, Damodar was known as the river of distress even in Jharkhand. But after the Dam on the Damodar was built, flood could have put under control. 'Damodar Valley Corporation (DVC) was established on 18 February 1948 after the independence with the primary aim of flood control, irrigation and power production. The person of Jharkhand in the region around the river Damodar has established themselves here with a lot of hope and aspirations. They never lost their mind even after the Damodar engulfs their lands several times, as flexibility is the main characteristic of these people. The findings of the paper is to establish the living of the people and role of Damodar in the valley of Damodar in Jharkhand.

দীর্ঘদিন যাবৎ নানা রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপট সহ্য করে অবশেষে ১৯৫৬ সালে 'Bihar and West Bengal transfer of territories Act' আইন পাশ হলে মানভূমকে ভেঙ্গে তিন টুকরো করা হয়। যার ফলে বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল ধানবাদ, চন্দনকেয়ারী ও চাষকে পৃথক করে বিহারের অর্ন্তভূক্ত করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৫৬ সালে ১ নভেম্বর অবশিষ্ট মানভূমের অংশ পুরুলিয়া নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পৃথক জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে ২০০০ সালের ১৫ নভেম্বর বিহারকেও ভেঙ্গে পৃথক নতুন রাজ্য ঝড়খণ্ডের সৃষ্টি করা হয়। রাজনীতি দুটো স্থানকে পৃথক করে দিলে কিন্তু প্রকৃতি কিন্তু হৃদয় হীনতার পরিচয় দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যবর্তী সীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দামোদর নদী, যা এই দুটো রাজ্যের মানুষের জীবন, অর্থনীতি, সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর 'নদ' হিসাবে পরিচিত হলেও ঝাড়খণ্ডে 'নদী' রূপেই পরিচিত।

দামোদর নদীর উৎপত্তি স্থল রাঁচির প্রায় ৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পশ্চিম বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) ছোটনাগপুর পর্বত মালায়। ছোটনাগপুর মালভূমির অর্ন্তগত পালামৌ পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে হাজারিবাগ, চাতরা রামগড়, কোদার্মা, গিরিডিহ, ধানবাদ, জেলা হয়ে পরে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও হুগলী জেলার উপর দিয়ে ২৪,২৩৫

বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে দামোদর নদী প্রবাহিত। দামোদরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩৬ মাইল। এই দৈর্ঘ্যের প্রথমাংশে প্রায় ১৮০ মাইল দক্ষিণ পূর্বমূখে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। পরে প্রায় একই অভিমুখে রাণীগঞ্জের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। ঝাড়খণ্ডের দীর্ঘতম নদী হল দামোদর। দামোদর সাঁওতালি নদী বাঁচক শব্দ। দামোদর এ রাজ্যে 'DAMUDA' নামে পরিচিত। 'DAMU' মানে পবিত্র আর 'DA' মানে জল। পূর্বে দামোদর ঝাড়খণ্ডে 'দুঃখের নদী' বলে পরিচিত ছিল কিন্তু দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে বাঁধ নির্মাণ হবার পর বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে দামোদর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রথমিক লক্ষ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা পরিচালন, জলবিদুৎ উৎপাদন ইত্যাদি।

১৯১৬, ১৯২৩, ১৯৩৫, ১৯৪৩ সালে ঝাড়খণ্ডের দামোদর তীরবর্তী অঞ্চল ভয়ানক বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। পরে ভারত সরকারের উদ্যোগে এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। প্রথম বাঁধ তিলাইয়া নির্মিত হয় দামোদরের শাখানদী বরাকরের উপর ১৯৫৩ সালে। দ্বিতীয়টি কোনার নদীর উপর ১৯৫৫ সালে। অপর দুটি তৈরী হয় বরাকর ও দামোদরে যথাক্রমে মাইথন (১৯৫৭) ও পাঞ্চেৎ (১৯৫৮)। উল্লেখ্য যে মাইথন ও পাঞ্চেৎই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রধান বাঁধ।

মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধের জলকে কাজে লাগিয়েই এখানকার সেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে চালিত হচ্ছে। দামোদর নদীতে তৈরী পাঞ্চেৎ বাঁধের দৈর্ঘ্য ২,৫৪৫ মিটার। এর জল ধারণ ক্ষমতা ১,৪৯৭ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। সেখানে থেকে ২৮ লক্ষ হেক্টর দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিজমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হয়। এর ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনও প্রভাবিত হয়েছে।

দামোদর তীরবর্তী ডোমগড়, তাসরা, সরিষাকুড়ি, বিরসিংপুর প্রভৃতি গ্রামে কুড়মি (মাহাত), সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাঙালি, বিহারী জাতির বাস, আদিবাসীদের জীবন জীবিকা কৃষিকাজ ভিত্তিক। এদের মধ্যে কুড়মি (কুর্মি)রা বিশেষ করে পেশায় কৃষিজীবী। বঙ্কিম চন্দ্র মাহাতর মতানুসারে এদের মতো কৃষিকর্মে দক্ষ সম্প্রদায় শুধু ঝাড়খণ্ডে কেন, ভারতের অন্যত্রও খুব বেশি নেই। গ্রামের নদী সংলগ্ন চাষজমি বর্ষাকালে জলের তলায় চলে গেলেও দূরবর্তী গ্রামের ভিতরের কৃষিজমিগুলোতে ধান, গম, শাক-সবজি চাষ করে এদের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়। এছাড়া গ্রামের মাঝি, মুণ্ডারা দামোদরের মৎসজীবি হিসাবে কাজ করে। দামোদরের এখানে প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সাথে; বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার সাথে সংযোগ সেতুর কাজ করেছে। এর ফলে দুটো রাজ্যের মধ্যে মেলবন্ধন হচ্ছে তাই নয়, প্রতিদিন এখানে নৌপথে বহুযাত্রী পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে আসা যাওয়া করে। এর ফলে মাঝিদের জীবন জীবিকাও প্রভাবিত হচ্ছে। নদীর তীরে অনেক ইঁট ভাটা দেখা যায়। সেখানে বহু শ্রমিক কাজ করে জীবনধারণ করে। এছাড়াও সরিষাকুড়ি গ্রামে বিশেষভাবে বাঁশের টোকরি শিল্প গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি এসব অঞ্চলে মৃৎশিল্পও গড়ে উঠেছে।

ঝাড়খণ্ড কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধ উপায়ে বস্তায় ভরে সাইকেলের মাধ্যমে কয়লা দামোদরের পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। এভাবেও বহুলোক দিনে কয়লা প্রাচার করে প্রতিবারে ১০০ টাকা করে উপার্জন করছে।

অর্থনীতির মতো দামোদর এখানকার সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে। মানবজীবনের চিরকালীন ঐতিহ্যের ধারক হল লোকসংস্কৃতি। দীর্ঘকাল অবধি যা লোকসামাজ অনুসরণ করে এসেছে, বিশ্বাস করেছে, আচরণ করেছে, ব্যবহার করে চলেছে তাই লোকসংস্কৃতি। ঝাড়খণ্ডের এই দামোদর তীরবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ সীমানা লাগোয়া) অঞ্চলেরও নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি আছে। ঝাড়খণ্ডে দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলের প্রধান উৎসব গাজন বা চড়ক। গাজনের (গা+জন) অর্থ গ্রামের জনসাধারণ। গাজন বা চড়কের উল্লেখ্য অংশ গাজুনে সন্ন্যাসীদের আত্ম নির্যাতিত আত্ম নিবেদন; বানফোঁড়া, ঝাপান, পাটভাঙা, মশান, শবনৃত্য, কাঁটাঝাপ, জিবফোঁড়া প্রভৃতি। এটি একটি দলবদ্ধ নৃত্য

গীত। এতদ অঞ্চলের ঘরবর গ্রামে গাজনের বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়। গম্ভীরা গানের প্রধান অকর্ষণ। গম্ভীরা শব্দের একাধিক অর্থ; শিবের মন্দির, গাজন উৎসব, শিবের উৎসব। শিবালয় সংলগ্ন স্থানে সে গান পরিবেশিত হয় তাই গম্ভীরা গান। আবার 'গম্ভীরা' হলো গাজন উৎসব বা শিবের উৎসব সংশ্লিষ্ট গান, এ ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। শিবের এক নাম গম্ভীর, তাই সেদিক থেকে বিচারেও গম্ভীরের গানকে গম্ভীরা গান বলা যায়। গম্ভীরার চারটি পর্যায় থাকে- বন্দনা, চার ইয়ারী, ডুয়েট ও রিপোর্ট। স্বদেশ-বিদেশ, সমকাল, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সবই এই গম্ভীরায় স্থান পায়।

আমরা জানি পুরুলিয়া জেলাতেই পঁচিশ-ছাব্বিশ রকমের ঝুমুর প্রচলিত। পুরলিয়া উত্তরে দামোদর নদী তীরবর্তী প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও ঝুমুর গানের প্রচলন আছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝুমুর গানের প্রচলন আছে। মাদল ও শিঙ্গা সহযোগে এই ঝুমুর গান গাওয়া হয়। কীর্তনের সঙ্গে এর মিল অনেক। অমিলও কিছু কিছু আছে। কীর্তন থেকে ঝুমুরে, ঝুমুর থেকে কীর্তনে আসা যায়। শুধু পুরুলিয়া জেলা নয় সমগ্র ছোটনাগপুরের শ্বাস-প্রশ্বাসে ঝুমুর সঙ্গীত মিশে রয়েছে, এত বড় ব্যাপ্তি অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না। বৈষ্ণবীয় কীর্তন গানের যে ঘরানাগুলি আছে তার মধ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে প্রচলিত ঘরানার নাম 'মান্দারিণী'। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও গড় মন্দারণের নাম পাই। আনুমানিক ১৬৩২/৩৩ খ্রীস্টাব্দে যখন পাঁচেটে জমিদার ছিলেন বীরনারায়ণ এবং মল্লরাজা ছিলেন বীরসিংহ, তখন মোগলের আধীনত্য স্বীকার করে রাঢ়ভূমি। আজকের পুরুলিয়া তখন ছিল 'মান্দারণ সরকারে'র অন্তর্ভূক্ত। সেই 'মান্দারণ' থেকেই ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত ঘরানাটির নাম 'মান্দারিণী'।

এছাড়াও বাঁধনা পরবের আহিরা গান, মনসাপূজার জাঁত গান ও দামোদর তীরবর্তী ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত আছে যা রাঢ় বঙ্গভূমির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। জাওয়া পরব ও করম পরব ভাদ্রমাসের পার্শ্বৈকাদশী (11^{th} moon of Hindu month Bhadrapada) তে অনুষ্ঠিত হয়। জাওয়াগীতে পশ্চিমবঙ্গের মত ঝাড়খণ্ডেও কুর্মালি ভাষার প্রভাব দেখা যায়।

মনসা পুজা উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ডের এই অঞ্চলের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল পুঁথি থেকে গান করা হয়। ঢাকী (ডম্বরু) বাজিয়ে একটা বিশেষ সুরে এই গান গাওয়া হয়। একটি ধুয়ো বা ধ্রুব পদ বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে সুর, তাল, লয় ঠিক করা হয়। এই ধ্রুবপদকে 'জাঁত' বলে। বহুক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের কাহিনির ধ্রুবপদ ব্যবহার করা হয়। সমসময় বেহুলা বা লখিন্দরের কাহিনি কেন্দ্রিক হয় না। ফলে এই 'জাঁত' গানগুলো কখনো কাহিনি সম্পর্কিত, কখনো রাধাকৃষ্ণ, কখনো বা লৌকিক জীবন সম্পর্কিত হয়।

ভাষার সাহায্যে মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। আবার এই ভাষাই কোন অঞ্চলে স্থানভেদে, রূপভেদে, সমাজভেদে, পৃথক ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তার এক-একটি রূপ উপভাষা (Dialect) নামে পরিচিতি পায়। যেমন বাংলা ভাষায় কথা বলে উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, রাঢ়বঙ্গ, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ও ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ জন। ভাষা গবেষকরা বাংলা ভাষাকে পাঁচটি উপভাষায় বিভাজন করেছেন- (১) রাঢ়ি, (২) বঙ্গালি, (৩) বরেন্দ্রী, (৪) ঝাড়খণ্ডী, (৫)কামরূপী। ঝাড়খণ্ডের দামোদর তীরবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ সীমানা লাগোয়া) অঞ্চলটির বাংলা ভাষা-ভাষি মানুষ ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথা বলে। যেহেতু এখানে বহু ভাষা-ভাষি মানুষ বসবাস করে। ফলে ভাষার মাধ্যমে ভাব-ভালোবাসার মেলবন্ধন হয়েছে। খোরটা, হিন্দী, কুড়মালী, সাঁওতালি, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার ব্যবহার এই অঞ্চলে দেখা যায়।

সাঁওতালি, খোরটা প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগ খুব ঘনিষ্ট। সাঁওতাল ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক কেন তা অনুসন্ধান করেছেন ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক তাঁর 'আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা' গ্রন্থে। তাঁর মতানুসারে চর্যাপদে দেখি সাঁওতাল তথা সমগ্র আধিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্র এখনও জীবন্ত ভাবে দেখতে পাই ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে- যার সীমানা রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, ধানবাদ থেকে বাঁকুড়া,

পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে। বনজঙ্গল ঘিরে হরিণ শিকার, অযোধ্যা পাহাড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার সাঁওতালদের শিকার উৎসব বা সেন্দরা পরবকে স্মরণ করিয়ে দেয় (চর্যা-৬), মত্ত হস্তীকে পোষ মানানো (চর্যা-৯), নগর প্রান্তে ডোমটুলিয়ায় ডোমনীর সাথে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সমাজের উঁচুমানের লোকের মিলন কাহিনি (চর্যা-১০), মেয়েদের দলবদ্ধ গান আর পুরুষদের বাদ্যযন্ত্র সহ নাচ (চর্যা-১৭), আদিবাসী পাড়ায় আখড়ার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়, মাদল বাজিয়ে ডোম্বী বিবাহে কাহ্নপাদের যাত্রা (চর্যা-১৯)। আজ থেকে হাজার বছর আগের সাহিত্যে সে সমাজ জীবনের ছবি আমরা দেখি, তাতে আদিবাসী জীবনযাত্রা তথা সাঁওতাল সমাজ ও বাঙালি হিন্দু সমাজ পাশাপাশি মিলিয়ে গেছে। অন্যদিকে খোরঠা ভাবার নুমনা হল-

"*খোরঠা ঝাড়খণ্ডেক গোটে উত্তরী ছোটনাগপুর, সন্থাল পরগণা ছাড়া রাঁচী, পলামুক হিসসামে পসরল হ্যায়।*"

দামোদর নদীকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সাথে ঝাড়খণ্ডের একটা নিত্য যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় এখানে দুটো রাজ্যের মধ্যে বাংলা ভাষার কথ্যরূপের মিশ্রণ ঘটে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার একটি পৃথক রূপ গড়ে উঠেছে, যাকে 'বিভাষা' বলা যেতে পারে। যেমন-

"*দামোদর লে জল নাইখে, আজ জল আইসবেক লাই।*"

চরিত্রের ভিন্নতা, পারিপার্শ্বিকের ভিন্নতা, মানসিকতার ভিন্নতা ও বিষয়ের উপযুক্ত পরিস্ফুটনের জন্য ভাষা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছে যা তাৎক্ষণিক ও অভিধান বহির্ভূত। 'লাইখে', 'আইসবেক লাই' শব্দগুলি সৃষ্টির এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই অঞ্চলের মানুষেরা অনেক আশা, স্বপ্ন নিয়ে দামোদরকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করেছে। কিছু করতে না পারলেও দামোদরের জলকে কাজে লাগিয়ে তারা চাষ-বাস, নৌকা চালনা, মৎসচাষ শুরু করে। এখানকার মানুষের সংস্কৃতি চেতনা যথেষ্ট রয়েছে। তবে তাদের সংস্কৃতি চেতনার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত পরিস্থিতির দুর্বলতা তো আছেই। পাশাপাশি DVC এদের জমিজায়গা কেড়ে নিয়েছে অথচ কোন চাকরির সুবন্দোবস্ত করেনি। নদী তীরবর্তী জমিগুলোও দামোদর গ্রাস করেছে। তবে মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নেই। এখানকার অধিবাসীরা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শিখেছে। তাই যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন মোকাবিলা করার সামর্থ্য তাদের আছে। দামোদর এদের জমিজায়গা গ্রাস করে নিলেও এরা সহজে ভেঙ্গে পড়েনি, ওদের মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল স্থিতিস্থাপকতা। দামোদর এখানকার মানুষকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিখিয়েছে। ফলে জীবনের নেতিবাচক দিককে দূরে ঠেলে এরা বর্তমানকে সুন্দর করে তোলার কাজেই সদা ব্যস্ত।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা লাগোয়া দামোদর তীরবর্তী ঝাড়খন্ডের গ্রামগুলোর শিক্ষা পরিস্থিতি বেশিরভাগই মাঝারি ধরনের। তবে কিছু গ্রাম শিক্ষাগত দিক থেকে একে বারে পিছিয়ে। আবার কিছু সংখ্যক গ্রাম শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে। এই গ্রামের সংখ্যা তুলনায় কম। তবে নিরক্ষরের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কারণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রামগুলিতে কার্যকর। দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলির শিক্ষা পরিস্থিতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—
১) দুর্বল, ২) মাঝারি, ৩) উচ্চমানের।

যে গ্রামগুলিতে শিক্ষাপরিস্থিতি একেবারে দুর্বল, সেখানে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডী পার হতে পারলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শোনা করেই থেমে গেছে। যেখানে শিক্ষা মাঝারি ধরণের সেখানে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গিয়ে থেমে গেছে। স্বল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ে উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডী পার হয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করছে। আসলে পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকলেও অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অসচ্ছলতা-ই তাদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যসমাজের অগ্রগতির পথে বড় সম্বল দুটির একটি হল শিক্ষা ও অপরটি গ্রন্থাগারের সহায়তা। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অঞ্চলে

গ্রন্থাগারের কোনও সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বিদ্যালয় অর্জিত বিদ্যার ধারাবাহিকতা ও সংরক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে সমাজ শিক্ষায় এতদ্ অঞ্চল পিছিয়ে রয়েছে।

দামোদর তীরবর্তী-ঝাড়খন্ডের এতদ্ অঞ্চলের মানুষদের লোকভাবনা বা সাংস্কৃতিক চেতনা হল খুব সহজ, সরল ও সাধারণ প্রকৃতির। কোনও প্রকার জটিলতা এরা পছন্দ করে না। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই দুর্বল প্রকৃতির। এর প্রতিফলন তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে। গ্রামবাসীদের শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার মুলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী। কেননা সংসারের প্রয়োজন তারা অল্প বয়সে কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হয়। ফলে শিক্ষার জগৎ থেকে তারা পিছিয়ে পড়ে। দামোদর কেন্দ্রিক গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরই প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। তবে পরিমাণে অল্প হলেও চাষের জমিগুলো তাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব। আবার যারা মৎসজীবী তাদের একমাত্র অবলম্বন হল দামোদর নদী। তবে দামোদরের বৈশিষ্ট্য হল সারা বছর নদীতে সমপরিমাণে জল থাকেনা, জল শুকিয়ে যায়। তখন মৎসজীবীদের চরম ভোগান্তি হয়। বাড়ির মেয়ে-বউরাও কাজে নেমে পড়েছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই দুর্বল যে বিনোদন তাদের কাছে বাতুলতা মাত্র।

দামোদর তীরবর্তী ঝাড়খন্ডের অপর প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন্ধুর মত অবস্থান করছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাটির কিয়দংশ দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। ঝাড়খন্ডের লোক সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতির ছায়া পড়েছে। যেমন— পুরুলিয়া বাউল, কীর্তন, ঝুমুর, জাঁতগান ঝাড়খন্ডের লোক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে পুরুলিয়ার বাংলা ভাষার প্রভাবে ঝাড়খন্ডের ঝাড়খন্ডী উপভাষায় নিজস্ব কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়ে ভাষা নতুন রূপ ধারণ করেছে যাকে 'মানভূমি বিভাষা' বলা যেতে পারে।

সামগ্রিক ভাবে আলোচনার পর দেখা যায় যে তাদের সমস্যা আজও বর্তমান। বহুক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য তারা পাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন সংস্কার তরফ থেকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। আর এই কাজ সমাজের ভূমিকা অবশ্যই থাকবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১। পুরুলিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজন্য অবদান, প্রবীর সরকার, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০৮, কলকাতা-৯।
২। লোকসংস্কৃতি ও আধিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, কলকাতা-৬৮।
৩। পুরুলিয়া লোকসংস্কৃতি, মিতা ঘোষ বক্সি, অক্ষর প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১০, কলকাতা-৬।
৪। ঝুমুর, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেপ্টেম্বর-১৯৯৯।
৫। সিন্ধু থেকে সুবর্ণরেখা (কুড়ুমি জাতির ইতিহাস), জ্যোতিলাল মাহাত, প্রকাশক পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়ুমি সমাজ, দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজ এবং 'টেঁসফুল' কুড়ুমালি আখড়া (সিন্দরী, চাষমোড়) পুরুলিয়া, মে-২০০৪।
৬। স্বদেশ চর্চালোক, বাংলার নদ-নদী জলাশয়-১, সম্পাদনাঃ প্রণব সরকার, বইমেলা, ফেব্রুয়ারি-২০১৩।
৭। জল, সম্পাদনাঃ দেবাশিষ সেনগুপ্ত, পরমেশ গোস্বামী, কল্যাণ রুদ্র, এভেনাল প্রেস, ১লা জানুয়ারি-২০১৪।
৮। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা, সম্পাদনাঃ তাপস ভৌমিক, কোরক, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা-৫৯।